বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির

অভিভাষণ।

১৩২০

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অভিভাষণ

[কলিকাতায় সাহিত্য সম্মিলন]

আজ আমাদের অতি শুভদিন। আজ বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। এই সম্মিলন ছয় বার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল বারই মফঃস্বলে, সদরে—কলিকাতায় এই প্রথম। সম্মিলনের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদিগের এবার যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, এত উদ্যম ও অধ্যবসায় পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। এই বিশাল সভাগৃহে, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় জীবন কাটাইতেছেন, যাঁহারা সেই সাহিত্যসেবায় বিপুল যশোলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহারা নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাভাষা হইতে নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে উপহার দিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষা হইতে নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষার কাব্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য রচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, যাঁহারা নানা মাসিকপত্রে লিখিয়া, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমাজস্থ, কি ইতর, কি ভদ্র, সকল লোককেই শিক্ষা ও আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা গদ্যে, পদ্যে, গানে, গীতে, দেশস্থ লোকদিগকে মোহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এখানে দেখিতে পাইতেছি।

[ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাঙ্গালাসাহিত্য]

এ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শুভসম্বৎসর। ভারতবর্ষে, আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে, বাঙ্গালাভাষার স্থান অতি উচ্চ হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে ইহার গৌরব তত বিস্তৃত হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুসংখ্যক পুস্তক ইংরাজীভাষায় অনূদিত হইলেও ইউরোপ অঞ্চলে বঙ্গীয় লেখকগণের কৃতিত্ব কেহ এ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এবৎসর শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইউরোপ তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব স্বীকারই করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় লেখকগণের সেজন্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আমাদের এবৎসরের উদ্যোগ আরও শুভফল প্রসব করিয়াছে। বাঙ্গালা-ভাষার লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের গবর্ণমেণ্ট অনেকদিন হইতে অনেক টাকা খরচ করিয়া আসিতেছেন। সভা করিয়া, সমিতি করিয়া, সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়া, উপাধি দানে ভূষিত করিয়া, তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এবার স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল—আমাদের পরমভক্তিভাজন রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিনিধি, সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সম্মিলনের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া, সম্মিলনের—বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী দিগের যে উপকার সাধন করিলেন, বঙ্গবাসী তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

[লর্ড কারমাইকেল ও বাঙ্গালা সাহিত্য]

লর্ড ক্লাইব ও লর্ড হেষ্টিংশ বাংলা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাহার পর প্রায় সকল বঙ্গেশ্বরই ইংরাজীতে বাঙ্গালীর সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু আমাদের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সাহেব শত শত গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বাঙ্গালীর প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তিনি বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়াছেন ও বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। সেদিন অধ্যাপক-মণ্ডলীর উপাধি বিতরণে তিনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি বাঙ্গালাভাষাতেই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাসনকর্ত্তার এইরূপ বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ সাহিত্য-সম্মিলনের আর একটি শুভফল।

এরূপ সভায় সমাগত সভ্যমণ্ডলীর অভ্যর্থনার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইতাম। যাঁহারা সভাসমিতিতে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন, সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে যাঁহারা চিরাভ্যস্ত, সভাসমিতি সংগঠন করিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, এরূপ কোন বিখ্যাত বাগ্মীর হস্তে এ ভার ন্যস্ত হইলে, আমার মনের বিশেষ তৃপ্তি হইত। যাঁহারা আমায় এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং আমি সেজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে, তাঁহাদের কাজ মনের মত না হওয়ায় শেষে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন।

আমার ভয় হয়, পাছে আমার দোষে তাঁহাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয়। আমার ভয় হয়, পাছে আমার ক্রটিতে তাঁহাদের সংকল্পিত ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

এবার কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য বড়ই অল্প। মফঃস্বলে সাহিত্য-সম্মিলন হইলে অভ্যর্থনা-সমিতি হন গৃহস্থ, নিমন্ত্রিত সভ্যমণ্ডলী হন অতিথি। সুতরাং অতিথিকে যেরূপ সম্মান করা উচিত গৃহস্থকে তাহা বিশেষরূপে করিতে হয়। এবার কলিকাতায় অধিবেশন হওয়ায়, কে গৃহস্থ, কে অতিথি, চিনিয়া উঠা ভার হইয়াছে। কে এমন বঙ্গবাসী আছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়, কলিকাতার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই? সুতরাং কলিকাতায় সকল বঙ্গবাসীই গৃহস্থ, সকল বঙ্গবাসীই অতিথি। অতএব অভ্যর্থনা-সমিতির কোন ক্রটি হইলে, সকলকেই সেটি আপনার ক্রটি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

[উপস্থিত সম্মিলনের বিশেষত্ব]

এইরূপ পরস্পর ক্রটি মার্জ্জনা করিয়া আপনারা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি হয়, বাঙ্গালা সাহিত্য যাহাতে সৎপথে চলিতে পারে, বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা যাহাতে দেশের লোকের মনে উদার ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মসম্মান ও আত্মজ্ঞান জন্মে, যাহাতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে দেশের ধনাগম হয়, যাহাতে দেশের যে সকল কলঙ্ক আছে, সে সকল দূর হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করুন।

[বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি]

দেশের লোককে ভাল ও মন্দ পথে লইয়া যাইবার বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষমতা প্রভূত। সেকালে ভাট্ ও চারণেরা রবাব ও বীণায় গান করিয়া রাজপুতদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিত। সাহিত্যের প্রভাবে, বক্তৃতার প্রভাবে, বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষীয় এমন কি সমস্ত এসিয়ার লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া গিয়াছিল। দেশীয় সাহিত্য লোককে যে পথে চালায় লোকে সেই পথে চলে। আপনারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সাহিত্যকে হাতে পাইয়াছেন। আপনারা এই সাহিত্যের দ্বারা দেশের যাহাতে ধনাগম হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, আত্মসম্মান রক্ষা হয় ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ জগৎটাকে কিছুই নয় বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যে এ দিকে দৃষ্টি একেবারেই ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টি জীবনের ওপারে কেবল পরলোকের দিকেই

ছিল। তখন কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি হয় নাই। জীবিকা উপার্জ্জন, প্রাণধারণ এত কঠিন ব্যাপার হয় নাই। তাঁহাদের দিনে তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা শোভা পাইয়াছে। তাঁহারা ভিক্ষা পাইতেন; লোকের ছিল, তাহারা ভিক্ষা দিত। সাহিত্যসেবিগণ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। কিন্তু এখন জগতের গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে, এখন ভিক্ষা পাওয়া যায় না। ভিক্ষায় আত্মসম্মান রক্ষা হয় না। তাই আপনা-দিগকে বলিতেছিলাম বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা আপনারা বঙ্গবাসী-দিগকে সর্ব্বপ্রথমে "পরিশ্রমের মাহাত্ম্য" (Dignity of labour) শিক্ষা দিউন। ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত করুন। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশবাসীকে যে পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে আপনারা তাঁহাদিগকে কতকটা নিবৃত্ত করুন, তাঁহারা পরকাল পরকাল করিয়া লোককে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন, আপনারা তাহাদিগকে ইহকালের কথাও স্মরণ করাইয়া দিন। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, যে, ইহকাল ও পরকালের পরস্পর সংস্রব ও সম্পর্ক অতি নিকট ও অতি ঘনিষ্ঠ। যখন ইহকালে থাকিয়াই পরকালের চেষ্টা করিতে হইবে, তখন ইহকালকে একেবারে উপেক্ষা করা কোন মতে উচিত নয়, আপনাদের সাহিত্যে যেন এ উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

[ইহকাল ও পরকাল উভয় দিকে]

অদ্যকার সমাগমে ২৪ পরগণা ও কলিকাতার লোক গৃহস্থ, আর যত বাঙ্গালী সকলেই অতিথি। বাঙ্গালী বলিতে গেলে আগে কলিকাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে সুতরাং এবার গৃহস্থ ও অতিথির লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। তথাপি চিরন্তন প্রথা অনুসারে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। বলিতে হইবে আমরা তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা এস। আমরা বলিতে গেলে কলিকাতার লেখকমণ্ডলী ও ২৪ পরগণার লেখকমণ্ডলী। কলিকাতার কথা পরে বলিব, সূচিকটাহের ন্যায় আগে ২৪ পরগণার কথাটা বলিয়া রাখি। অনেকের সংস্কার যে ২৪ পরগণা অল্পদিন পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। এ অল্পদিন বলিতে গৃহস্থের অল্পদিন বুঝায় না, ভূতত্ত্ব-বিদের অল্পদিন বুঝায়। বাঙ্গালার অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা ২৪ পরগণা যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে

[অভ্যর্থনা সমিতি ও নিমন্ত্রিতবর্গ]

[চাব্বিশ পরগণা ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে]

[৪০০ বৎসর পূর্ব্বে] সমস্ত ২৪ পরগণা জেলাকে 'বুড়নিয়ার দেশ' বলিত অর্থাৎ বর্ষাকালে উহা জলে বুড়িয়া যাইত। এখন বুড়নিয়ার দেশ আছে, কিন্তু তাহা ২৪ পরগণা হইতে কিছু দূরে। বুড়িয়া যাইত বলিয়া যে দেশে লোক ছিল না বা সাহিত্যচর্চ্চা হইত না, এমন নয়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ২৪ পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পুঁথিপাঁজি লিখিতেন, ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তমলুক বন্দর লোপ হইলে পিছলদা ও ছত্রভোগ সমুদ্র-যাত্রিদিগের প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইত। গঙ্গার ধারে যে সকল গণ্ড-গ্রাম ছিল, তথায় যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম্ম ও সাহিত্যচর্চ্চা হইত। খড়দহ গ্রাম বহু-দিন হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সমাজস্থান ছিল। মাইনগর ও জাগুলিতে কায়স্থদিগের বড় বড় সমাজ ছিল। কুমারহট্ট বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান স্থান ছিল। খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত যে কাটি-গঙ্গা আছে, তাহা যখন কাটা হয় নাই, তখন অর্থাৎ চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, গাঁড়ুলে, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, চাণক, খড়দহ, শুকচর-পানিহাটী, কামারহাটি, এঁড়েদহ, বরাহনগর, চিৎপুর, কলিকাতা, ধলণ্ড, কালিঘাট, চূড়াঘাট, জয়ধূলি, ধলস্থান, বারুইপুর, ছত্রভোগ ও পিছলদা এই সকল গণ্ডগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের বৃদ্ধ পরিকর-গণের মধ্যে তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরীর বাড়ী কুমারহট্টে। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি ভাই কুমারহট্ট হইতে যাইয়া নবদ্বীপে টোল করিয়াছিলেন। পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত চৈতন্যদেবের একজন প্রধান সেবক। বরাহনগরের ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন। তেমন সরস, সুমধুর ও তানলয়বিশুদ্ধ পদ্যানুবাদ, বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত আর কখনও হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই ২৪ পরগণার পূর্ব্বাঞ্চলে কতকগুলি মুসলমান পীর ও ফকিরের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বহুসংখ্যক ভিক্ষুহীন বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লন। পূর্ব্বে যে বালাণ্ডা পরগণার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে এক্ষণে আর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় না, সব মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যে মাদুর বোনা বালাণ্ডা পরগণার প্রধান সম্পত্তি, সে মাদুর এখন মুসলমানেই বোনে। যে সুন্দরবন এককালে কালু

[বনবিবির জহুরানামা] রায় ও দক্ষিণ রায় নামক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষের লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন তাহা বনবিবি ও সা জঙ্গুলীর লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। বড়গাজী, বড় পীর, পীর গোরাচাঁদ, প্রাচীন বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধাচার্য্যদিগের স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং মুসলমানী বাঙ্গালায় আপন আপন পীরত্বের কিচ্ছা লিখিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বনবিবির জহুরানামা অতি আশ্চর্য্য। বনবিবি ও তাঁহার ভাই সা জঙ্গুলী আল্লার দরবার হইতে আসিয়া মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপর হুকুম থাকে যে, তাঁহারা সুন্দরবন দখল করিবেন। সুন্দরবন তখন দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব। তিনি বড়ই পরাক্রান্ত দেবতা। জলে তিনি কুমীরে চড়িয়া বেড়ান, ডাঙ্গায় তিনি বাঘে চড়িয়া বেড়ান। বাঘ ও কুমীর তাঁহার বাহনও বটে, সেনাও বটে। ফকিরেরা তাঁহার সহিত লড়াই করেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাই বনবিবির ও সা জঙ্গুলীর আবিভাব। ইহারা মদিনা হইতে ভাঙ্গড়ে উপস্থিত হইলে ভাঙ্গড়ের বড় গাজী তাঁহাদিগকে দক্ষিণ রায়ের পরাক্রমের কথা কহিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ রায়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া 'যুদ্ধ দাও' বলিয়া বসিলেন। দক্ষিণ রায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার মা নারায়ণী আসিয়া বলিলেন "বাবা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই কত্তে যাবে। হারলে বড়ই লজ্জা, জিৎলে নাম নাই। তুমি থাক, আমি লড়াইয়ে যাই।" নারায়ণীতে ও বনবিবিতে সাতদিন লড়াই হইল। কাহারও জয় পরাজয় হয় না। এমন সময় একদিক হইতে বিষ্ণু ও অন্য দিক হইতে আল্লা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধি হইয়া গেল। বনবিবি সমস্ত সুন্দরবনের বাদসাহ হইলেন। দক্ষিণ রায় আঠার ভাঁটির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ আঠারটি ভাটায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অধিকার পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বনবিবির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইল। সা জঙ্গুলী এবং অন্যান্য পীরেরা বনবিবির অধীনে সুন্দরবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পীর গোরাচাঁদ কোথা হইতে আসিলেন, জানা যায় না। তবে তিনি চন্দ্রকেতু রাজা ও তাঁহার তিন পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া ও তাঁহাদের [পীরগোরাচাঁদের পুঁথি] বধসাধন করিয়া অনেকটা দেশ দখল করিয়া লইলেন। হাড়োয়া গ্রামে তাঁহার আস্তানা আছে। সেখানে এখনও মেলা হইয়া থাকে। পীর গোরাচাঁদ এখন হিন্দু ও মুসলমান সকলের আরাধ্য দেবতা, কারণ তিনি মুস্কিলে আসান করিয়া থাকেন। অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে

যে, ফকীরেরা এখনও "পীর গোরাচাঁদ মুস্কিলে আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা করে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালায় সেরসাহের আবির্ভাব হয়। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমানভাবে দেখিতেন। আপনারা অনেকেই যবন হরিদাসের বৈষ্ণব হইবার কথা শুনিয়াছেন। আরও শুনিয়াছেন যে, রামচন্দ্র খাঁ, হরিদাস বৈষ্ণব হওয়ায়, তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল। সে সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। রামচন্দ্র খাঁর বাড়ী ২৪ পরগণার উত্তর সীমার নিকটে। উহাকে কাগজপুকুর বলে। রাম খাঁর পুত্র ভুবনেশ্বর কবিকণ্ঠাভরণ সেরসাহের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সেরসাহ ক্রমে যখন বিহার, অযোধ্যা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা দখল করিয়া বাদশাহ হইলেন, তখন এই সকল দেশে ভুবনেশ্বর সেরসাহকে দিয়া অনেক গ্রাম ও ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করাইয়াছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণ সেরসাহের সহিত নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তকের বলে তিনি এক অতি প্রকাণ্ড Encyclopædia আরম্ভ করেন। সংস্কৃতে আঠারটি বিদ্যা আছে। তিনি সেই আঠারটি বিদ্যারই এক একটি Encyclopædia লিখিবার চেষ্টা করেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের গ্রন্থ নেপালে ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লণ্ডন নগরে আছে। এই দুই গ্রন্থে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যত লোক সঙ্গীত ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এরূপ Encyclopædia লেখার কথা মনে হইলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর [মধ্যভাগে মোগল পাঠানের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে চব্বিশ পরগণায় বিশেষ কোন উৎপাত ঘটে নাই। কারণ শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদের প্রধান কর্ম্মচারী বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়া আপন জায়গীরে [প্রতাপাদিত্য] আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার জায়গীর যমুনা হইতে সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমস্ত চব্বিশ পরগণা, যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ এই জায়গীরের অধীন ছিল। বিক্রমাদিত্য যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন ২৪ পরগণায় শান্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া বাদশাহকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুরী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রের উপকূলভাগ দখল করিয়া লইলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত

প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার সময় সংস্কৃত-সাহিত্যের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় কুশদহ পরগণায় একজন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণসিদ্ধান্ত, কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য নানারূপ কৌশলে তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোন সমকালীন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক খবর পর্টুগীজ মিশনারীদিগের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে পাটনা নগরে বিজ্জলদেব নামে একজন চৌহান রাজা ছিলেন। তিনি জগমোহন নামে একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের একখানি Gazetteer প্রস্তুত করেন। উহার নাম 'দেশাবলী বিবৃতি।' উহাতে প্রতাপাদিত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, সমস্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য অনেকবার মোগল সৈন্য পরাজিত করিলে দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীর আমেরের রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্য বন্দী হন। তাঁহাকে খাঁচায় পুরিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যে সকল লোকের সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করেন, তাঁহাদের একজনকে ২৪টি পরগণা দেওয়া হয়। সেই জন্য এ অঞ্চলের নাম ২৪ পরগণা হইয়াছে। বিজ্জলদেবের পুস্তকে টাকী ও কুশদহের অনেক বর্ণন আছে। টাকীর চৌধুরীরা চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লন এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। এ অঞ্চলে তখন অনেক সিদ্ধ পুরুষের বাস ছিল, তাহার মধ্যে কুশদহের কৃষ্ণসিদ্ধান্ত ও গুণানন্দ প্রধান। ইঁহারা উভয়েই কালীভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণসিদ্ধান্ত প্রতাপাদিত্যের গুরু ছিলেন ও গুণানন্দ তাঁহার স্থাপিত যশোরেশ্বরীর পুরোহিত ছিলেন। টাকীর চৌধুরীদের আদিপুরুষ দুর্লভ গুহ। তাঁহার পুত্রের নাম ভবানীদাস গুহ। ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র ছিল।

এই সময়ে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েরা তাঁহাদের আদি নিবাস নিমতা হইতে বড়িষায় গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিমতা নিবাসী কায়স্থ কবি কৃষ্ণরামও বড়িষায় যান। সেখানে দক্ষিণ রায় তাঁহাকে

স্বপ্ন দেন। তিনি বলেন "মাধবাচার্য্য আমার মঙ্গল লিখিয়াছে; কিন্তু সে মঙ্গল আমার পছন্দ হয় নাই, সে ইতিউতি করিয়া বই সারিয়াছে। তুই ভাল করিয়া আমার মঙ্গল লেখ, তোর মঙ্গল গাহিবার সময় যে মন দিয়া না শুনিবে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে। আর তুই যদি না লিখস তাহা হইলে তোকেও বাঘে খাইয়া ফেলিবে।" রায় মহাশয়ের ভয়ে কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার রায়মঙ্গলখানি বেশ বই। রায়মঙ্গল লিখিতে তাঁহার হাত বেশ পাকিয়া যায়। তাঁহার পর তিনি কালিকা-মঙ্গল লেখেন। কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের গল্প। বিদ্যাসুন্দরের গল্প লইয়া অনেকেই কালিকামঙ্গল গান করিয়াছেন। কিন্তু কালিকামঙ্গলের আদি কবি কৃষ্ণরাম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হইবার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল লিখিত হয়। বাঁকুড়া হইতে কালিকামঙ্গলের এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সেখানি ইং ১৭৫৩ সালে হাটখোলায় এক সওদাগরের গদিতে উহার দোতালা ঘরে নকল করা হয়। দক্ষিণা এক জোড়া কাপড় ও দুটি টাকা। ইহার পর বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি ১৭৩১ সালে কলিকাতায় বসিয়া প্রাকৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন। ১৭৫৩ সালে হালিসহর নিবাসী কবি রামপ্রসাদ সেনের অন্নদা-মঙ্গল রচিত হয়। ঠিক এই সময় আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলও রচিত হয়। ভারতচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে মূলাজোড়ে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, তাঁহার গ্রন্থ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে লিখিত হয় বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কতকগুলি সুপণ্ডিত দাক্ষিণাত্য বৈদিক দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া ২৪ পরগণায় বাস করেন। রাজপুর, হরিনাভি মজিলপুর তাঁহাদের আদিস্থান। সেখান হইতে তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণে অনেক গ্রামে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেলে একজন পাশ্চাত্য বৈদিক ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী ভাটপাড়ার ঠাকুরগোষ্ঠী হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হয়। দেশের বাণিজ্য সমস্তই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশের শিল্পও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান শিল্প

বাণিজ্য প্রভৃতিতে কলিকাতা বঙ্গদেশের, এমন কি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ২৪ পরগণার ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত। সুতরাং ২৪ পরগণার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কলিকাতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি ২৪ পরগণার অনেক প্রধান প্রধান লেখক ও পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া উহার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের জীবনচরিত লিখিতে গেলে, এমন কি নাম উল্লেখ করিতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সেই জন্য আমরা এইস্থলে কয়েকজন মাত্র প্রধান লেখকের বৃত্তান্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

প্রথম রামনারায়ণ তর্করত্ন। ইঁহার নিবাস হরিনাভি। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক লেখেন। তাহার মধ্যে কয়েকখানি সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত নাটকের যাহা দোষগুণ, সমস্তই তাহাতে বর্ত্তিয়াছে। এখানে তাহার সবিস্তার সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে যে দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হাস্যরসের নাটক, রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে যে বহুবিবাহ প্রথা চলিতেছিল ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার দোষ দেখাইতে গিয়া এই গ্রন্থে তৎকালে যে সকল বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য টিকি ও দীর্ঘ ফোঁটার জোরে জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহাদের প্রতিও যথেষ্ট কটাক্ষ করা হইয়াছে। ঘটক মহাশয়েরা শত মুখে পরের বংশাবলী বর্ণনা করিতেন। একেবারে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বর ও কন্যা পর্য্যন্ত উভয়কুলের পূর্ব্বপুরুষদিগের নামকীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু নিজের পিতার নাম করিতে বলিলে মাথা চুলকাইতেন। বলিতেন, "কি জানেন, পরের বাপ, যা হয় তাই একটা বলিয়া দিলাম। কিন্তু নিজের বাপের বেলা কি সে রকম করা যায়?" কুলীন মহাশয়েরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়াও কেবল পূর্ব্বপুরুষেরা কেহই কুল ভাঙ্গেন নাই, এই গুণে সর্ব্বত্র সমাদর পাইতেন, ও শত শত বিবাহ করিতেন। এই নাটকে একজন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের গল্প আছে। তাঁহার নাম অভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উপাধি লইয়া অভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে তাঁহার বিদ্যার দৌড় অত্যন্ত অধিক। তিনি বলেন,

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কন শুন সমাচার॥

দ্রৌপদী কান্দিয়া কহে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
অধিকার করিলেক রাজত্ব লঙ্কার॥

পণ্ডিত মহাশয় হাস্যরসের বর্ণনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, উপরিলিখিত ঘটনা হইতে তাহার অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার নবনাটকখানিও বর্ত্তমান সমাজের চিত্র। এখানিতে কিন্তু হাস্যরসের নামও নাই। প্রেম ও শোকের উচ্ছ্বাসে ইহা পরিপূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয় অনেকদিন স্বর্গস্থ হইয়াছেন। লোকের রুচি ফিরিয়াছে। তাঁহার নাটকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু যে কেহ তাঁহার নাটক পড়িবে, সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার মত অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। অধ্যাপনাকালে ইংরাজী শিখিয়া তিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস তর্জ্জমা করিয়াছিলেন; অনেকগুলি সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু "সোমপ্রকাশে"ই তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। সোমপ্রকাশ নূতন ধরণের সংবাদপত্র। ইহাতে ইংরাজী সংবাদপত্রের ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। পরে উহার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। সোমপ্রকাশের সংস্কৃতবহুল ভাষা সেকালের লোক অত্যন্ত পছন্দ করিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও নিজেই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে তিনি কল্পদ্রুম নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। সে মাসিক পত্রেরও যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। মুঙ্গের ও জামালপুরের কেরাণী মহাশয়েরা সেই মাসিকপত্রে লিখিতেন ও যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পেন্সন লইয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিনি খুব হিসাব করিয়া চলিতেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রাখিয়া ধনে মানে বিভূষিত হইয়া পরলোকগমন করেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংবাদপত্র সমূহের তিনিই আদি।

(বঙ্কিম বাবু)

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া

কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঘোষাল মহাশয় বহুদিন যাবৎ প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্য লাভ করিয়া বলিলেন "আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার আর কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি তোমায় দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিবে।" ঘোষাল মহাশয় কহিলেন "আমার দিনই চলে না, কি করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব।" তিনি কহিলেন "আমি আসা পর্য্যন্ত যেরূপে পার চালাও, আমি আসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।" কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একখানি তালুক লিখিয়া দিয়া গেলেন। ঘোষাল মহাশয়েরা বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভী-মেলে দুইজন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুইটি কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাই-দিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোকগমন করিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল তাহারই বংশে বঙ্কিমবাবুর জন্ম। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাধাবল্লভের সেবায়েৎ এবং নবাবী ও ইংরাজী আমলে রাজসরকারে চাকরী করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সর্ব্বপ্রথম যে চারিজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী প্রদান করেন, তাহার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর পিতা একজন। বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর প্রথম বৎসরের প্রথম বি, এ। কলেজ ছাড়িয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীতে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি আই ই উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিনজন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নবেলগুলি বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার মধ্যে দুই একখানি ইংরাজীর ছায়া লইয়া

লিখিত হইলেও অধিকাংশই বঙ্কিমবাবুর নিজের। বঙ্কিমবাবুর নবেল হইতে বাঙ্গালার কি প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্য, "Knowledge filtered down" করিবার জন্য বঙ্গদর্শন নামে মাসিকপত্র বাহির করেন। তাহার কথা কিছু বলিব। তিনি ৪ বৎসর মাত্র এই মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। এবং এই চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনই বাঙ্গালাভাষার আদর্শ মাসিকপত্র হইয়া আজিও রহিয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ নিজে লিখিতেন তাহা নহে, তিনি অনেককে লিখিতে শিখাইতেন। ইউনিভার্সিটীর অনেক গ্রাডুয়েট তখন বঙ্গদর্শনে লিখিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, বঙ্কিমবাবুও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যে বাঙ্গালা লিখিতে গেলে দুইটি জিনিষের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়—Clearness ও Perspicuity। পুঁটুলী-পাকান লেখা তিনি একেবারে দেখিতে পারিতেন না। যাহা বলিবার আছে একেবারে সোজাসুজি বল। তোমার লেখা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথা ঘামাইতে হইবে কেন? এই চারি বৎসরের পর বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকে। তারপর তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদকের ভার লইয়া আরও ৪।৫ বৎসর বঙ্গদর্শন চালান। এ কয়েক বৎসরও বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের প্রধান লেখক। কিন্তু এবার তিনি একটু সুর ফিরাইয়াছিলেন। এবার তিনি নবেলে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মকে আবার বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। তাহাতে আবার দুই দল হয়। একদল একেবারে পুরাণো সব ফিরাইয়া আনিতে চান; আর একদল বলেন, না বাপু তাহা হইবে না। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দুয়ানী করিতে গেলে আর চলিবে না। কিন্তু হিন্দুয়ানীটা ফিরাইয়া আনা চাই। বঙ্কিমবাবু এই শেষোক্ত দলের কর্ত্তা ছিলেন। সেই জন্য আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রচার নামক আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু আমাদের এখানে থামিতে হইবে, কারণ পুঁথি বাড়িয়া যায়।

২৪ পরগণার কথা এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু কলিকাতার

কথা সবিস্তার বলিতে গেলে অনেক Volume লিখিতে হয়; সুতরাং ছাঁটিয়া বাছিয়া কেবল মোটা কথা বলিয়াই শেষ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা গঙ্গাতীরে একখানি গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাসও অনেক ছিল, এমন কি উহা ব্রাহ্মণ সমাজও ছিল। রাজা তোডরমল কলিকাতা নামে একটি পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার প্রধান নগর বলিয়াছেন কলিকাতা। সুতরাং তাঁহার সময় কলিকাতা শুদ্ধ যে গণ্ডগ্রাম ছিল তাহা নহে, একটি পরগণার মাথা হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৯২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা তিনটি গ্রাম কিনিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত। কিনিবার ছয় বৎসরের মধ্যেই কোম্পানী কলিকাতায় একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। গঙ্গার ধার হইতে সেই কেল্লা লালদিঘী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সে কেল্লার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে উইলসন সাহেব তাহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। কোম্পানীর আমলেও কলিকাতায় বাঘ আসিত। এক ব্রাহ্মণ বাঘের ভয়ে রাত্রিতে এক সোনারবেণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার জ্ঞাতি গোত্রেরা তাঁহাকে জাতিতে লইলেন না। তাঁহার বংশধরেরা আজিও সোনারবেণের ব্রাহ্মণ হইয়া রহিয়াছেন। আমি এ কথা ওই ব্রাহ্মণের প্রপৌত্রের নিকট শুনিয়াছি। গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটীতে চিৎপুররোড পর্য্যন্ত বসতি ছিল। তাহার পূর্ব্বে কোথাও চাষ হইত। কিন্তু অধিকাংশই ছিল বন এবং জলা। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতা কেমন করিয়া সমস্ত বঙ্গের ও ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হইল, সে কথা সকলেই জানেন, তাহার পুনরুক্তি বৃথা। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল জলাভূমির মধ্যস্থলে একটি পুকুর কাটিয়া সেই মাটি দিয়া তাহার চারিপাশের জমি উঁচু করিয়া সেই উঁচু জমির উপর সকলে বাস করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালেও কলিকাতার অনেক জায়গায় মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে চাষ হইত। ক্রমে কলিকাতা নগর এই তিনটি গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া চারি দিকেই অনেক দূর অবধি গিয়াছে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যে লণ্ডন ছাড়া এত বড় সহর আর নাই। এবং এসিয়াখণ্ডেও

পিকিন ছাড়া এত বড় সহর আর নাই। আমরা এ সহরের ইতিহাস প্রদানে অক্ষম। তবে এখানে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু কিছু দিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৭৩১ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ বাঙ্গালায় গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন। সে অনুবাদখানি আমি পড়িয়াছি; তাহার ভাষা এবং ছন্দ অতি সুন্দর। কবিবর রামপ্রসাদ কলিকাতায় কোন সওদাগরের বাড়ী চাকরী করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে হিসাব রাখিতে হইত। তিনি কিন্তু হিসাবের খাতার চারিপাশে কালীবিষয়ক গান লিখিয়া রাখিতেন। একদিন সওদাগর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাই তিনি অতি দুঃখে লিখিয়াছেন—

যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম
দেশ বিদেশে,
তখন ভাইবন্ধু দারা সুত
সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন নাই
আমায় দেখে সবাই রোযে।

রামপ্রসাদের কালীবিষয়ক কবিতাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগে। ভিখারীরা যখন দ্বিপ্রহর বেলায় রামপ্রসাদী সুরে কালীবিষয়ক গান করে, তখন দারুণ গ্রীষ্মেও শরীর জুড়াইয়া যায়। রামপ্রসাদের পর কলিকাতায় দিনকতক সাহিত্য যেন চুপচাপ হইয়া যায়। ইংরেজেরা তখন দেশের প্রকৃত রাজা হইয়াছেন, কিন্তু স্বহস্তে দেশপালনের ভার লন নাই। সে সময়টাকে অরাজকতা বলা যায় না বটে, কিন্তু সেটা বড় ভীষণ সময়। দেশে শান্তি ত একেবারেই ছিল না, চুরিডাকাতিও যথেষ্ট ছিল। ক্রমে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় শান্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কবিওয়ালার দল কবি গাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবির লড়াই লোকে হাঁ করিয়া শুনিত। উভয় পক্ষেরই গোঁড়া ছিল। হারজিৎ কবির যত হোক না হোক, গোঁড়াদেরই হইত। গোঁড়ারা বহু দূর হইতে কবি শুনিতে আসিত এবং হারজিৎ হইলে অপর পক্ষকে খুব টিট্‌কারী দিত। কবি হইতে ক্রমে হাফ আখড়াই, তাহার পর সখের যাত্রা, তারপর পেশাদারী যাত্রা, তারপর সখের থিয়েটার,

তারপর পেশাদারী থিয়েটার হইয়াছে। উত্তরোত্তর কাব্যাংশে শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে। অনেকে কবিওয়ালাদের নাম শুনিলেই নাক সিঁটকাইয়া বলেন যে, উহারা কেবল খেউড় গাহিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক সময় উহাদের গানে যথেষ্ট রসিকতা থাকিত এবং চটপট চাপান ও উত্তরে যথেষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পাইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হাফ আখড়াইএর দল বড় প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা গান বাঁধিত, গান গাইত ও কতকটা কবির দলের মত ছিল। তাহার পর সখের যাত্রার আরম্ভ হয়। আমরা বালককালে প্রথম সখের যাত্রার গল্প শুনিয়াছি। কলিকাতার বাবুরা অনেকে একত্র হইয়া একটী সখের যাত্রার দল করিয়াছিলেন ইহার বড়ই জাঁকজমক ছিল। যাত্রার দলের ছেলেরা কিন্তু প্রায়ই মাহিনা পাইত। যাত্রার মাঝে মাঝে সং হইত। প্রথম সং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার। বিচারের বিষয় এটা—"কামিনী কি যামিনী?" এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় নস্য লইয়া দীর্ঘ টিকি নাড়িয়া বলিলেন "এটা কামিনী", আর একজন বলিলেন "এটা যামিনী।" ক্রমে এক হাতে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনে আসরের দুই কোণে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে আসরের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়া ঝুটাপুটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের রাজপরিবর্ত্তন ঘটে। অন্যান্য দেশে রাজবিপ্লবে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ও হাঙ্গাম হুজ্জুত হয়, এদেশে ততদূর ঘটে নাই। ইংরাজেরা এই ৪০ বৎসরের ভিতর ধীরে ধীরে প্রথমতঃ সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যের ভার, তাহার পর রাজস্বের ভার, তাহার পর দেওয়ানীর ভার, তাহার পর ফৌজদারীর ভার, তাহার পর পুলিশের ভার গ্রহণ করেন। লড়াই ঝগড়া হয় নাই বলিলেই হয়; তথাপি রাজ-পরিবর্ত্তন হইলেই লোকের মনে একটা ত্রাস হয়। সে ত্রাসের সময় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেই পারে না। সে সময় যাঁহারা রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য করেন, যাঁহারা সামাজিক শাসন করেন, তাঁহাদেরই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক হয়। তাই আমরা এই ৪০ বৎসরের মধ্যে বড় বড় লেখক, কবি, গ্রন্থকার দেখিতে পাই না। এসময়কার বড় বড় লোক মহারাজা নন্দকুমার, মহারাজা নবকৃষ্ণ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নীলমণি ঠাকুর, রাজা গোকুল ঘোষাল। ইঁহারা ইংরাজের চাকুরী করিয়া অথবা ইংরাজের সহিত কারবার করিয়া প্রভূত ধন, মান, পসার ও প্রতিপত্তি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের

যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্তের পরও দেশে ঠিক শান্তি স্থাপিত হয় নাই, লোকের মনের ত্রাস যায় নাই। কারণ তখনও চুরি ডাকাতি বড়ই অধিক হইত। কিন্তু তথাপি কলিকাতায় বিশেষ গোল-যোগ ছিল না। এবং কলিকাতা হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতিঃ চারি-দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। সূক্ষ্ম ইতিহাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। অষ্টা-দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। ইঁহার নিবাস থানাকুল কৃষ্ণনগর। ইনি চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র। কিন্তু ইনি আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন এবং অনেক ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজী ভাষা শিখিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি ইঁহার আস্থা কমিয়া যায়। ইনি বেদান্ত ও উপনিষদের ধর্ম্ম যথার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গালায় গদ্য রচনার সূত্রপাত করেন। ইনিই প্রথম বলেন যে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোককে সংস্কৃত বা আরবী শিক্ষা না দিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিন। ১৮১৭ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট যখন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন ইনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন এবং বাঙ্গালায় এক-খানি ব্যাকরণ লিখেন। ইংরাজীতে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থাকিলেও এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে হিন্দুরা ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে এক ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন। সভায় রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। নৈহাটী নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বাঞ্চলে নিমন্ত্রণে গিয়া একটী পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ শিশুকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং তাহাকে ব্যাকরণ সাহিত্য ও ন্যায় শিক্ষা দেন। সেই বালকই পরিণামে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। নৈহাটী হইতে আসিয়া তিনি দিনকতক রামমোহন রায়ের নিকট চাকুরী করেন। পরে সে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মসভার লেখক হন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিলে গৌরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার তাহার জবাব দিতেন। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইত লোকে আগ্রহ সহকারে সেইগুলিই পাঠ করিত। কেহ বা রামমোহনের জয় দিত, কেহ বা গৌরীশঙ্করের জয় দিত। বলিতে গেলে বাঙ্গলায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রন্থের এই উৎপত্তি। গৌরীশঙ্কর 'সংবাদ ভাস্কর' নামে একখানি খবরের কাগজ বাহির করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার দেখাদেখি 'সংবাদ প্রভাকর' বলিয়া আর একখানি খবরের কাগজ বাহির করেন। তখন খবরের কাগজে রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির আলোচনা হইত না। গল্প রচনা, পদ্যরচনা এবং সে সময়কার হিন্দুসমাজের ঘটনা লইয়া কাগজের কলেবর পূর্ণ হইত। গৌরীশঙ্কর প্রায়ই ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি কটাক্ষ করিতেন এবং ঈশ্বর গুপ্তও গৌরীশঙ্করকে খুব গালি দিতেন। লোকে খুব আমোদ করিয়া পড়িত। 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইবার পর এই শ্রেণীর সংবাদ পত্রের প্রতিপত্তি কমিয়া আইসে।

রামমোহন রায়ের পর কলিকাতায় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে রামকমল সেন ও রাজা রাধাকান্ত দেব। রামকমল সেনের পিতৃনিবাস গরিফা। তিনি তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ান হইয়া কলিকাতায় খুব পসার করিয়া ফেলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনের পুত্র। ইঁহারা দুইজনে দুইখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। রামকমল সেন বাঙ্গালায় ও রাধাকান্ত দেব সংস্কৃতে। রামকমল সেনের পূর্ব্বে আর একখানি বাঙ্গালা অভিধান হইয়াছিল। সেখানি সুপ্রসিদ্ধ পাদরী কেরি সাহেব সঙ্কলন করেন। রামকমল সেনের অভিধানে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত দেশী ও সংস্কৃত উভয়বিধ শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে দেশীর ভাগই বেশী। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম ইংরাজী ধরণের সংস্কৃতের প্রথম Encyclopaedia। শব্দকল্পদ্রুমের পর সংস্কৃতে আরও Encyclopaedia হইয়াছে, কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সমস্তই সেই প্রণালীতেই লিখিত। ইঁহারা দুজনেই ইংরাজীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং দেশে যাহাতে ইংরাজীর বহুলপ্রচার হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতার একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিবাস ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী বীরসিংহ গ্রামে। তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন, এবং তথায় ইংরাজী ও সংস্কৃতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন এবং স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি অতি উদারচেতা, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন।

দয়াগুণে ও দানের প্রভাবে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্ত তিনি বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিয়াছেন। যতদিন শিক্ষাবিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততদিন কিসে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার ছিল সংস্কৃত ভাল করিয়া না শিখিলে ভাল বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারে না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করেন। তখন বাঙ্গালায় একদল লেখক সৃষ্টি করা তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে বাঙ্গালায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত। তিনি এইরূপ সরল ভাষায় অতি দক্ষতা সহকারে আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালাই, ভাল বাঙ্গালা বলিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বই পড়িয়াই অনেকে মানুষ হইয়াছেন। তাই আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে এখনও দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তা হন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যের দিকে বড় আসে নাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে তিনি তৎকালে বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের পর তিনি বিলাতে গিয়া যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হন। ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা থাকায় ও সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তায় কালযাপন করায় লোকে তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়াছেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একপ্রকার প্রাণ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়া, তত্ত্ববোধিনীতে নানারূপ প্রবন্ধ লিখিয়া এবং উপনিষদ গুলি বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই ৺ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান নেতা হইয়া উঠেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার আচার্য্য পদবী গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রধান বক্তা ছিলেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহারও খ্যাতি প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম

করিয়া Europe ও Americaয় গিয়াছিল। তাঁহার লেখা ও তাঁহার বক্তৃতা অতি সরল ভাষায় লিখিত। উহাতে খাঁটি সংস্কৃতের ভাগ অতি কম। 'সেবকের নিবেদন' বলিয়া তিনি যে কয়েক volume পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিত এবং তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে নববিধান ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় সকল ধর্ম্মেরই সমন্বয় করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান পুরুষের নামোল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের প্রতিভা শুদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দুসমাজের আরও নানা ব্যাপারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন যে সকল ব্যক্তির নাম করিতেছি, সাহিত্যই ইঁহাদের মহারথ এবং ইঁহারাই সাহিত্যের মহারথী। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত এই মহারথীকুলের সর্ব্বপ্রথম। ইনি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার নিবাস চুপী। ইনি বহুদিন কলিকাতায় বাস করেন এবং জীবনের শেষাংশে গঙ্গাতীরে বালি গ্রামে বাস করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহু কাল বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের স্কুলপাঠ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল পুস্তকের বিষয় তিনি অধিকাংশই ইংরাজী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও লোকে তাঁহাকে এই সকল প্রবন্ধের জন্য অধিক চেনে, এবং তাঁহাকে মান্য করে; কিন্তু এগুলি তাঁহার প্রধান কার্য্য নহে। যে গ্রন্থের জন্য তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহার নাম "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।" ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত কি ইংরাজী, কি জার্ম্মন, কি ফ্রেঞ্চ, কি লাটিন, কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের অনুক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থেও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা-প্রণালী ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন তিনি উইলসন সাহেবের Hindu Sects নামক গ্রন্থ হইতে সকল কথাই লইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। উইলসনের Hindu Sectsএ যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা তাঁহার পুস্তকে আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি উইলসনের Hindu Sects হইতে

কিছুই লন নাই। তৎকালে কলিকাতায় একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ ব্যক্তি কলিকাতায় কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি উড়িয়া, কি মাড়োয়ারী সকল জাতিরই সহিত বেশ মিলিতে পারিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তাহাদের নিগূঢ় খবরগুলি আনিয়া দিতে পারিতেন। তিনিই উইলসন সাহেবেরও মুরুব্বি, তিনিই অক্ষয়কুমার দত্তেরও মুরুব্বি। সুতরাং দুইখানি পুস্তকের অনেক কথা একই রূপে লিখিত হইয়াছে। আমাকে যাঁহারা বলিয়াছেন, এই ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দুস্কুলের ছাত্র। তিনি প্রথম হইতেই ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিবাস সাগরদাঁড়ী। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। মধুসূদন হিন্দুস্কুলে পড়িতে পড়িতেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ও বড়ই একগুঁইয়া ছিলেন। তিনি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে কলিকাতা হইতে পলাইয়া মান্দ্রাজে গিয়া এক ফিরিঙ্গী রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং সকল ভাষা হইতেই ভাল ভাল ভাব বাছিয়া লইয়া আপনার কবিতার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়ে যে কেহ পদ্য লিখিত, মিল করিয়া লিখিত। মাইকেল বলেন এরূপ মিল করিয়া লিখিতে গেলে ভাব প্রকাশের অসুবিধা হয়। তাই তিনি মিলের বন্ধন কাটাইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে অনেকেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি কোন পণ্ডিত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যকে বিদ্রূপ করিবার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরী বধ' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা অনেকেরই মনে নাই। মাইকেলের মেঘনাদবধ এখন বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তখন নাটক লিখিতে গেলে সকলেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিত। মাইকেল ইহার বড় বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি নূতন ধরণে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লিখিলেন। পাইকপাড়া রাজবাটীর থিয়েটারে বিপুল আয়োজনের সহিত উহার অভিনয় হইল। অভিনয় খুব জমিয়া গেল। নাটকে সংস্কৃতের অনুকরণ এই হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন,—

Michael Madhusudan Datta was wayward as a son, wayward as a husband, wayward as a father, wayward as a student, but his waywardness in poetry alone payed.

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেলের কাব্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মাইকেলের কাব্যের সমালোচনা করেন। মাইকেলের কাব্য পড়িয়াই তাঁহার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার কবিতাবলী সকল বাঙ্গালীরই অতি আদরের জিনিষ। বঙ্কিমবাবু তাঁহার বৃত্র-সংহারের সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃত্রসংহার জনসমাজে বিশেষ আদর পায় নাই। তাঁহার দশমহাবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ।

হেমবাবুর ন্যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মহাকাব্য পদ্মিনী জনসমাজে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে।

ইহাঁদের পর আমাদের খ্যাতনামা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-বলি ও গীতাবলীর মধুর স্বরে ও মধুর ভাবে কেবল বঙ্গবাসী নয় সমস্ত জগতকে তিনি মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন ও তাঁহার সম্মুখে তাঁহার গুণগান করা প্রণালীবিরুদ্ধ বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও অধিক বলিতে পারিলাম না।

২৪ পরগণার কথা বলিতে গিয়া বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল বলিয়াছি। কলিকাতায় কত নভেল-লেখক ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রমেশ বাবুর নাম না করিলে নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে। রমেশ বাবু বঙ্গমাতার একটি কৃতী সন্তান। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া, এমন কি ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে, ইংরাজীতে দক্ষ ও বৃহস্পতি ছিলেন। রমেশ বাবু নিজে সিবিল সার্বিশে অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্যে যত প্রতিপত্তি, সাহিত্যে তত নহে। কি ইংরাজীতে কি বাঙ্গলাতে এই দুয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক নভেল-লেখক-দিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি ঋগ্বেদের বাঙ্গালা তর্জ্জমা প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম নাটকগুলি সংস্কৃতের অনুকরণে লিখিত হইত, কিন্তু অভিনয় ইংরাজী ধরণেই হইত। কারণ সেকালে হিন্দুদের যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ছিল, যেরূপে সেই গৃহ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইত, তাহা এখনও লোকে জানে না। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সেকথা জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং থিয়েটারও ইংরাজী ধরণে হইত, অভিনয়ও ইংরাজী ধরণে

হইত, পটপরিবর্ত্তনাদিও ইংরাজী ধরণে হইত। মাইকেলও ইংরাজী ধরণে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটারটা পুরা ইংরাজী ধরণের হইয়া গেল। প্রথম ২০।৩০ বৎসর থিয়েটার বড়লোকের বাড়াতেই হইত। তাঁহারা যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন তাঁহারাই দেখিতে পাইতেন, অন্য কেহ পাইত না। ১৮৭১।১৮৭২ সালে পেষাদারী থিয়েটার আরম্ভ হয়। প্রথম পেষাদারী থিয়েটার এক ভদ্রলোকের দালানে হইয়াছিল, তারপর ইংরাজী ধরণে থিয়েটার গৃহ হইতে লাগিল। মাইকেলের পর প্রধান নাটক-লেখক দীনবন্ধু মিত্র। ইনি সামাজিক ব্যাপার লইয়াই নাটক লিখিতেন। সামাজিক ব্যাপারে ঠাট্টা করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম ছিল। যদিও সেই সময়ের ব্যাপারেই তাঁহার নাটকগুলি খাটে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে উহা চিরদিনই আমোদের বস্তু হইয়া থাকিবে। কারণ দীনবন্ধু বাবুর লেখা বড়ই সরল এবং তাঁহার ভাব বড়ই গভীর। সমাজের মধ্যে সেখানে যে দুর্নীতিটুকু ছিল, তিনি সেটুকু খুলিয়া দেখাইয়া দিতেন। আর লোকে হাসিয়া অস্থির হইত। তাঁহার নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, জামাইবারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো ইত্যাদির অভিনয় আজিও হয় এবং লোকেও এই সকল গ্রন্থ পড়িয়া বড়ই আনন্দ বোধ করে। প্রথমে ইংরাজী শিখিয়া, মদ খাইয়া, অখাদ্য খাইয়া যে সকল যুবক উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিত, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দীনবন্ধু মিত্র যে সধবার একাদশী লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হাস্যরসের নাটক আজিও বাঙ্গালায় হয় নাই। তাহারা কথায় কথায় Shakespeare quote করিত, Byron quote করিত, কেহ হিতোপদেশ দিতে আসিলে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিত; কাহারও কথা শুনিত না, কাহাকেও মানিত না। কিন্তু তাহাদের পরিণাম অতি বিষম হইত। দীনবন্ধু বাবু সেইটী সধবার একাদশীতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর পর নাটককারদিগের মধ্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রধান। তিনি বহু গভীর ভাবের নাটক লিখিয়াছেন। তিনি অনেক বাঙ্গালা নভেল ও অনেক ইংরাজী নাটক অবলম্বনে বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর মাইকেল হইতেও বিভিন্ন। মাইকেলের লাইনে লাইনে অক্ষরগুলি মিলিত, ইঁহার তাহাও মিলিত না, কোন লাইনে ষোলটি অক্ষর কোনটিতে বা মোটে তিনটি। সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রকারেরা যে শান্তিরস লইয়া নাটক লিখিতে একবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে শান্তিরসকে তাঁহারা নাটক লিখিবার সময় কাব্যের

নবরস হইতে একবারে ছাঁটিয়া দিয়া গিয়াছেন, গিরিশ সেই শান্তিরস লইয়াই বুদ্ধদেব, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া বঙ্গসমাজকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সেবকেরা এটিকে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া থাকেন। এই সকল নাটক সম্বন্ধে মতামত দুই প্রকার হইলেও তাঁহার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। সেগুলি অতি গভীর ভাবের সহিত লিখিত।

ইদানীং যাঁহারা সামাজিক নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলাল বসুর বিশেষ উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু অমৃতবাবু আমাদের মধ্যেই আছেন, সম্ভবতঃ এই সভাতেই উপস্থিত আছেন। জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ সাধ্যমত পরিহার করিতেছি, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব। এই কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম পরিহার করিতে পাইলে কি সুখের হইত। কিন্তু সে সুখে আমরা বঞ্চিত। তিনি গত বর্ষেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; আজিকার সভায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ সম্মিলনে তিনি যোগ দিলেন না। নবদ্বীপের লোক হইলেও কলিকাতা তাঁহাকে ভুলিবে না! তিনিও অনেকগুলি নাটক লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি হাস্য রসের রচনায় দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাহিত্যে যে রসের ধারা আনিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন। তাঁহার স্বদেশভক্তিমূলক গানগুলিও দেশকে মাতাইয়াছে। অদ্য বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদের সম্মিলনে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি।

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগে বড় চাকরী করিতেন। ইঁহাদের নাটকগুলি ভাল হইলেও থিয়েটার ও অভিনয়ে বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকায় একটু লম্বা হইয়াছে। সময়ে সময়ে একঘেয়ে হইয়া যায়, সময়ে সময়ে নরম হইয়া যায়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় একথাটা এর মুখে না দিয়া, ওর মুখে দিলে ভাল হইত। গিরিশ বাবু আর অমৃত বাবু দুজনেই থিয়েটারের লোক। নিজেই সাজেন, নিজেই থিয়েটার সাজান, নিজেই নাট্যাচার্য্য, নিজেই নট, নিজেই সূত্রধর, নিজেই কুশীলব। ইহাঁদের নাটকগুলিতে ও সকল দোষ কিছুই নাই। ইহাঁরা যাবজ্জীবন প্রেক্ষাগৃহে থাকিয়া প্রেক্ষকবর্গের গতিবিধি, মনের ভাব বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যাহা ভাল লাগে

তাহাই দিতে শিখিয়াছেন। তবে এক মুস্কিল হইয়াছে; যাহারা পয়সা দেয় ইঁহাদের টান সেই দিকেই বেশী। পয়সা দেয় মুদী বাকালী, তাহারা চায় নাচ আর গান, সুতরাং ইঁহাদিগকেও গ্রন্থের মধ্যে নাচ ও গান অধিক দিতে হয়। যদি শিক্ষিতগণের সংখ্যা প্রেক্ষকগণের মধ্যে অধিক থাকিত, ইঁহাদের পুস্তক আরও ভাল হইতে পারিত। একজন নাটকলেখক একদিন আমার কাছে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাবজ্জীবন খাটিয়া নাটকের মর্ম্ম কতক জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিতে পারিলে কি হয়, আমরা মুদী বাকালীর জন্ম লিখিব বই ত নয়। ভদ্রলোকের হয় পয়সা নাই, নয় ত তাহারা এবিষয়ের জন্ম পয়সা খরচ করিতে রাজী নন।"

কলিকাতায় যে কয়জন লোক সাহিত্য-সেবায় অত্যন্ত বড় হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম। ইহা ছাড়া কলিকাতায় আর যে কত লোক আছেন, তার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই অল্প সময় মধ্যে তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। এরূপ নামোল্লেখের আরও দোষ আছে। অনেক সময়ে রামের নাম উল্লেখ করিয়া দেখি শ্যামের নাম না করিলে চলে না, আবার শ্যামের নাম করিয়া দেখি কৃষ্ণের নাম না করিলে চলে না। রাম শ্যাম কৃষ্ণ তিনজনের নাম করিলাম, নিজের কতকটা তৃপ্তি হইল, কিন্তু যাদু মাদু রাদুরও অনেকগুলি গোঁড়া আছেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন "দেখলে, লোকটা কি একচোখো, রাম শ্যাম কৃষ্ণের নাম কল্লে, আর আমাদের যাদু মাদু রাদুর নাম কল্লে না। যাদু রাদু মাদুই কি কম।" তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে কোন গোল নাই, কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহাদের নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

কলিকাতা এতকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। আমাদের পরম ভক্তি-ভাজন রাজরাজেশ্বর আসিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের হিতার্থ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লী লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালার অনেকে দুঃখিত, কিন্তু আমি বলি ইহাতে আমাদের বাঙ্গালীর দুঃখ করিবার কিছু নাই, বরং আনন্দিত হইবার কথা; কারণ বিশাল ইংরাজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে কলিকাতার স্থান লণ্ডনের নীচেই। আর বিশাল আসিয়াখণ্ডের মধ্যে কলিকাতার স্থান Pekinএর নীচে। ভারতের রাজধানী উঠিয়া যাওয়ায় কলিকাতার কিছু ক্ষতি হয় নাই। রাজরাজেশ্বর স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন It is the premier city in India. যে কলিকাতা সেই কলিকাতাই

রহিয়াছে ও রহিবে। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কলিকাতা যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, তাহা কিছু ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজধানী ছিল বলিয়াই হয় নাই। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজধানী উঠিয়া গেলে কলিকাতার কিছুই ক্ষতি নাই। বরং বাঙ্গালার রাজধানী ও বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া উহার উপর সকল বাঙ্গালীরই টান অধিক হইবে। সকল বাঙ্গালীই প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবে কিসে কলিকাতার মান বজায় থাকে। দুই বাঙ্গালা এক হইয়া যাওয়ায় এই টান আরও বাড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গবর্ণর শুধু বাঙ্গালীরই ছিলেন না। তিনি বেহারী ও উড়িয়াদিগেরও লেফ্‌-টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। এখন বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালার একেশ্বর। আগে বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিলে বেহারীরা ও উড়িয়ারা বলিয়া উঠিত, আমাদের দিকে বঙ্গেশ্বরের দৃষ্টি নাই। এখন আর সে কথা কেহ বলিবে না। এখন বঙ্গেশ্বর জানেন বাঙ্গালীরাই আমার প্রজা। বাঙ্গালীরাও জানেন বঙ্গেশ্বরই আমাদের প্রভু। ভাগের প্রভু নহেন, পূরাই প্রভু।

এই ত আমাদের নিজের কথা বলিলাম। আমাদের যাহা পুঁজিপাটা ছিল, খুলিয়া বলিলাম ও খুলিয়া দেখাইলাম। আমরা সমস্ত বাঙ্গালীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, এই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারাও আগ্রহের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কে এ কথা একবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া

বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটি অতি-প্রাচীন সভ্যদেশ। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাঙ্গালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু এ কথা স্থির, বাঙ্গালা নূতন দেশ নহে। যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গালাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহল-দ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথায়ও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা নানা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।

ফাহিয়ান তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্র-লিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তামা রপ্তানী হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামলজাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়। এখনকার anthropologistsরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা মঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ এখানে অতি অল্প দিনই আসিয়াছেন। এই কথায় অনেকেই অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গালীরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগকে আর্য্যজাতির বংশ বলিয়া গৌরব করে এবং আর্য্যদিগের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ত দেখা যায় যে, আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেমন নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের এক কোণে একটি ঢিল ফেলিয়া দিলে চারিদিকে আবর্ত্ত হইতে থাকে; প্রথম আবর্ত্ত যত উঁচু হয়, পরেরটি তাহা অপেক্ষা নীচু, তাহার পরেরটি তাহা অপেক্ষা নীচু; আর কোণে উপস্থিত হইবার সময় সে আবর্ত্ত অতি অল্পই দেখা যায়। সেইরূপ আর্য্য-আবর্ত্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি অনেক আর্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেকালে শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন খাওয়াইতে হইত; অর্থাৎ তিনি যেন শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপুরুষগণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতৃপুরুষগণকে যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া যাইতেছে, তিনি তাহা খাইতেছেন। এখনও অনেক দেশে জীবন্ত ব্রাহ্মণ দিয়াই শ্রাদ্ধ করে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ঐ কার্য্য দর্ভময় ব্রাহ্মণের করিতে হয়। অর্থাৎ এক গোছা কুশ লইয়া তাহাকে মানুষের আকার করিয়া গাঁথিতে হয়। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত সকল জিনিষ তাঁহাকে প্রদান করিতে হয়। বলা বাহুল্য বাঙ্গালাদেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে

হইয়াছিল। জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্ত্তের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিত তাহারা ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য হইত না। বেদে লেখা আছে, যদি কোন ব্রাহ্মণ মগধ দেশে বাস করেন তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট হইয়া যান। বাঙ্গালা ত আরও দূরে। এখানে বাস করিলে তিনি যে আরও নিকৃষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনৌজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাঙ্গালাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিষ্ঠাদিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্ম্মের ভার দিতেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশে। শিল্প শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালাই পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নিজ বঙ্গে এবং পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট ক্ষৌমি প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অন্য দুই একটী দেশেও রেশম শিল্প ছিল, কিন্তু তাহা তত ভাল নহে। ঐ গ্রন্থেই আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে তুলার কাপড়ও বাঙ্গালার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

মগধসাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র প্রধান বন্দর ছিল। একটি ভরতকচ্ছ ভড়ৌচি ও আর একটি তমলুক। ভরতকচ্ছ হইতে আরল্‌সাগর পার হইয়া লোকে বাণিজ্য করিতে যাইত। এবং তমলুক হইতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইত। ভরুচ্ছের সহিত আমাদের বড় সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বহুসংখ্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত,তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের দশ ভূমীশ্বর নামক গ্রন্থে লেখা আছে, "তোমরা নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছ, কর্ম্ম কর, শীলব্রত লও, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিবে এ সকলে কিছু উপকার হইতেছে না। যখন পাটলীপুত্র হইতে কেহ সমুদ্রের পারে ব্যবসা করিতে যাইত, সে ঘোড়া গাড়ী উট বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল এ সকলে কোন কাজই হইবে না। সমুদ্রে উট্‌ও যাইবে না, ঘোড়াও যাইবে না, গাড়ীও যাইবে না। তখন নূতন প্রকার যান বাহনের আবশ্যক হইবে।" সেইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল শীলব্রতাদির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সমুদ্রযাত্রা সেকালে অভ্যস্থ ছিল। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান তমলুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিতে লেখা আছে, তমলুক হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেষু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ হয়। অত-দিনের কথায় দরকার নাই; মুসলমান অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু পেগানে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজবংশীদাস লিখিতেছেন যে, চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপেরও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ গেলে পর, সমুদ্রে মহা ঝড় উঠে। তাঁহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল। ঝড়ের মধ্যে তাহার একখানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হইল, ইহার কিছু উপায় কর। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলে সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন দূরে দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীনকালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। সে

কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি হইলেই দেশ সুভিক্ষ হয়। সুভিক্ষ হইলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিয়ান্‌সাং বাঙ্গালার তিনটি নগরীতে দশ সহস্র সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দু ও জৈন ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কার্পাস তূলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গালাদেশ রেশমশিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। শন, পাট, ধঞ্চে এখনও বাঙ্গালায় একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়াই ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মালয় উপদ্বীপ, পেগান প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে তিনটি প্রধান বন্দর ছিল, মাদুরা কলিঙ্গনগর ও তমলুক; এই তিনটীর মধ্যে তমলুক অধিক প্রসিদ্ধ। তমলুক হইতে নানাদিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোন দোষ নাই। যদি কোন দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীরা প্রাচীনকালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রভাবে জানিতে পারা যায় যে, মগধদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কাম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকবার উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও আনামে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈব ধর্ম্মের প্রচার ছিল। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের যে Archaological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেগানে এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে ব্রাহ্মণেরা একসময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে 'প্রা' বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকলে বলে মগধ হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য

বহুদূর বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গালা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালাই অগ্রণী ছিল। সুতরাং এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব, এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ স্থাপন ত দূরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্যচর্চ্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবিগণ যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্পবাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ভিক্ষাজীবী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আমরা যেমন আছি তেমনই ভাল, সাহিত্যচর্চ্চায় কাজ নাই। এইবার বাঙ্গালার প্রাচীন বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চ্চার কথা কিঞ্চিৎ বলিব।

আবর্ত্তে আবর্ত্তে আর্য্যগণ অগ্রসর হইয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই এদেশীয়দিগের আচারব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্যবিজ্ঞান তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদে যে খাঁটী আর্য্যদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণে এবং অন্য বেদে সে খাঁটিটুকু আর দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় যে আর কিছুর সঙ্গে যেন মিশিয়াছে। একটা মোটা কথা দেখুন; ঋগ্বেদে শূদ্রের কথা একটিবার মাত্র আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিতে শূদ্রেরা সমাজের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি লিখিয়াছেন সেই ঋষি মহিদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু নিজগুণে ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হইয়া গিয়াছেন। যদি কেহ নিপুণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকলের চর্চ্চা করে, সেই দেখিতে পাইবে যে ব্রাহ্মণে যে সকল নূতন জিনিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা কতটা ঋগ্বেদের পরিণাম এবং কতটা বাহির হইতে আসিয়াছে। যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে তাহার কতটা পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে, কতটা বা পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়াছে। সেই খুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারিবে যে, আর্য্যেরা এতগুলি জিনিষ ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন ও এতগুলি তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। এইরূপে আবার দ্বিতীয় আবর্ত্ত

খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ও সূত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ হইতে সূত্রে বেশী কি আছে। সে বেশীর মধ্যে কোন্ গুলি ব্রাহ্মণের পরিণাম, কোন্ গুলি একেবারে নূতন। এই নূতন জিনিষগুলি কোথা হইতে আসিল? দেখা যায় যে অনেকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্যদিগের আনা নয়। এইরূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা যায় যে, আর্য্যদিগের উপর যেমন শূদ্রবর্ণ জুটিয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের উপর আর একটি বর্ণ জুটিয়াছিল, তাহাদের নাম অন্ত্যজ। আর্য্য অভিধানে যত শব্দ ছিল নূতন অভিধানেও অনেক শব্দ জুটিয়াছে। সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে সকল ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্য অভিধানে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এইরূপ আচারে বল, ব্যবহারে বল, উপাসনায় বল, দর্শনে বল, ধর্ম্মে বল, অধর্ম্মে বল, আহারে বল, অনেক নূতন নূতন জিনিষ আসিয়া এই মিশ্রিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গালায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন দেখা যাইবে আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী।

এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর আরও অনেক জাতি বাঙ্গালায় আসিয়াছে। বাঙ্গালার ভাষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সিংহলের ভাষা বড় একটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এবং সিংহলী ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এই ভাষা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা কেমন ছিল, অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একার্য্য এখনও পুরাতত্ত্বজ্ঞ কেহ করেন নাই। সাহিত্য-সম্মিলন হইতে এই দুই ভাষার তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা একটু আধটু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা সংস্কৃতমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভাল করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। মধ্যে সিংহলে পালিভাষার বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। পালিভাষা সংস্কৃতমূলক। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যক। পালিমিশ্রিত সিংহলী ভাষায় কোন কাজ হইবে না। বাঙ্গালাদেশে আমরা আর এক ভাষার সন্ধান পাইয়াছি, উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র বুঝা যায়, আর কিছু বোঝা যায় না। ক্রিয়াপদ-

গুলি এক অদ্ভুত রকমের। এবং ইহার বিশেষ্য শব্দগুলিও এক অদ্ভুত রকমের। এ ভাষারও বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অতি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক idioms বাঙ্গালাতেই আছে অন্য দেশে নাই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে যিনি আদি সেই লুইসিদ্ধাচার্য্যেরও গান পাইয়াছি। তিব্বতীয়েরা সিদ্ধাচার্য্যদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধাচার্য্যদিগকে আজিও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাকে সহজীয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। সহজীয়া ধর্ম্ম কি, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতাম যে সহজীয়া ধর্ম্ম চৈতন্য সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজীয়ার মত চৈতন্য দেবের প্রায় আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ লুই সিদ্ধাচার্য্যের গ্রন্থ ক্রমে দুর্ব্বোধ হইয়া আসিলে উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০০০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উহার সংস্কৃত টীকা লিখেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালা হইলে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করেন। সুতরাং তিনি একজন খুব বড় লোক ছিলেন। তিনি যখন লুইএর পুস্তকের টীকা করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তিনি লুইকে একজন পুরাতন ও বড়লোক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালায়ও লুইএর নাম একেবারে লোপ হয় নাই। ময়ূরভঞ্জে এবং পশ্চিমরাঢ়ে এখনও তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। দ্বারিক লুইএর নিজের চেলা। দ্বারিকেরও গান পাওয়া গিয়াছে এবং আরও অনেকগুলি প্রাচীন সহজীয়া কবির গান পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণাচার্য্য এই মতের একজন বড় লেখক। তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় এই মতের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় তাঁহাকে কানু কহে। তাঁহার গানগুলি অতি সরস ও মিষ্ট। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে "কানু ছাড়া গীত নাই।" আমরা মনে করি এ কানু আমাদের কৃষ্ণ কানাই। যেহেতু এখন গান লিখিতে গেলেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাই লিখিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের এ প্রাদুর্ভাব চৈতন্যের পর; এ প্রবাদ বাক্যটি কিন্তু তত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য আমি বিবেচনা করি এ কানু সেই প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণাচার্য্য বা

কাহ্ন। সরোরুহপাদ বা সরহ সহজীয়া ধর্ম্মের আর একজন কবি। তাঁহার অনেকগুলি দোঁহাও পাইয়াছি। তিনি ব্রাহ্মণ মানেন না জাতিভেদ মানেন না; ঈশ্বর মানেন না। ক্ষপনক ধর্ম্ম মানেন না। সৌন্নত মত মানেন না। তিনি বলেন বুদ্ধদেব সহজীয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ও সহজীয়া মত গুরুর মুখ ভিন্ন জানা যায় না। তাঁহার মতে মানুষের মন সহজেই মুক্ত। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বদ্ধ না করিলে কে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে? অদ্বয়বজ্র তাঁহার দোঁহাকোষের টীকা করিয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত রাজা রামপালের রাজত্বের ২৫ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামপালের রাজত্ব ৪২ বৎসর। ১০৬০ হইতে অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। অদ্বয়বজ্র তাঁহার পূর্ব্বে। সরোরুহ তাঁহারও পূর্ব্বে। সুতরাং বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকার বিস্তার হইবার তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে গান ও দোঁহা রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সময়ে আরও অনেক বাঙ্গালা গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত'। সুতরাং মহীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিষ সেকালে ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। তাহার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সারনাথে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (১০২৬)। মহীপালের গীত আজিও পাওয়া যায় নাই। মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই রাজা ছিলেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে ইঁহাদিগকে লইয়া আসা যায় না। বরং কিছু পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহাদের গীতগুলি যেমনটি লেখা হইয়াছিল তেমনটি পাই না। কারণ সেকালের লেখা পুঁথি পাওয়া যায় নাই। হয় যাহারা গায় তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, অথবা একালের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; এমন কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তি-যুক্ত শব্দ অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সহজীয়া গীত গান ছড়া ও দোঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বদল হয় নাই। যে পুঁথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান অধিকারেরও পূর্ব্বের লেখা। পুঁথিগুলি পাকানো তালপাতায় লেখা; সে তাল-পাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুঁথিগুলিতে

তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত তারিখ-ওয়ালা পুঁথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তিব্বত ভাষায় তর্জ্জমা আছে। তাই মনে হয় যদি তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থ সব খোজা যায়, আরও অনেক বাঙ্গালা গানের তর্জ্জমা পাওয়া যাইবে। হয় ত তিব্বত দেশে এই সকল বাঙ্গালা গানের পুঁথিও আছে। সাহিত্য-সম্মিলনের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে এই সকল বিষয়ে অন্বেষণ হয় তাহার বিষয়ে চেষ্টা করা।

পাল বংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা যে কেবল বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য নানা দেশে যাইত, তাহা নহে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও নানা দেশে যাইত। তিব্বতে তেঙ্গুর নামে ২৫২ volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা। ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। তর্জ্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন্ দেশের লোক তাহার নাম, তর্জ্জমাকর্ত্তার নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জ্জমাকর্ত্তা প্রায়ই দুইজন থাকিতেন। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর একজন তিব্বতীয়। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিক। এই তর্জ্জমা সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এই তেঙ্গুরের এখনও পুরা catalogue হয় নাই। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু catalogue হইয়াছে। সেই অল্প catalogue মধ্যেই আমরা প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালীর নাম পাইয়াছি। এই ৫০ জনের মধ্যে বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্গদেব ধর্ম্মপালের সমকালীন। তাহা হইলেই বুঝা গেল বৃদ্ধকায়স্থ খৃঃ ৮০০ সালে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা অনেক কায়স্থ তেলী ও সাহাদিগের নাম পাইয়াছি। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিব্বতীয়দিগের গুরু ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেও তাঁহারা সমস্ত তিব্বত দেশ নূতন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় মনে হয় নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরাণ কথা আছে। একটা কথা এই যে বাঙ্গালায় শান্তিপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন।

তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হন। সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভূক্ষেত্র নেপালী, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান। শান্তির ভনিতাওয়ালা দুচারিটী গান পাওয়া গিয়াছে। সে শান্তিও সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। জানি না দুই শান্তি এক হইবে কি না। শান্তির গান গুলিতে ভাষার একটু বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার ক্রিয়াবিভক্তির সহিত অন্য গানের ক্রিয়াবিভক্তি মিলে না।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজবিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বাঙ্গালা অক্ষরে পুঁথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারা বাঙ্গালীই ছিলেন। মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে করিয়া অনেক পুঁথি লইয়া যান। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস অন্বেষণ করিতে গেলে এই সকল পুঁথিই আমাদের প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে। নেপালের না কি জল হাওয়া ভাল, তাই সে সকল পুঁথি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, এখনও খুঁজিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

আমার বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আমি শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিব। এই মহাসভায় যাঁহারা অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহারা কে ও যাঁহারা অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই বা কে, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল। আবার বলি আমরা বাঙ্গালী, আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এককালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশস্থাপনে দক্ষিণ এসিয়ার মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালীরা বড় কম ছিল না। সেদিনও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙ্গালীরা মণিপুর আসাম, উড়িষ্যা ও বেহার চৈতন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং রাজপুতনার সুদূর মরুস্থলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। অল্পদিন হইল বাঙ্গালীরা ইংরাজ-রাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের ও ইংরাজরাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহাদের যত্নে, অধ্যবসায়ে ও উদ্যমে বাঙ্গালা সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্বোপরি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদর প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম দেশ, যাবা দ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমন কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না। দেশের মধ্যে কত কাজ পড়িয়া আছে। সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের পিতা কোথায় রাজত্ব করিতেন এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার আমরা কিছুই জানি না। অশোকেরও পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতের একটি প্রধান নগর ছিল। কিন্তু তাহা বঙ্গের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার কিছুই জানি না। এই যে নাথেরা আবির্ভূত হইয়া নানাদিকে শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা জন্মিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানি না। এই যে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যেরা এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন কথা জানি না। এই যে ভারতবর্ষে, বিশেষ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কেমন করিয়া গিয়াছে? তাহাই খুঁজিতেছিলাম। শেষে অল্পায়াসেই বুঝা গেল বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও লোপ হয় নাই। কয়েকজন অনুসন্ধানকারীর চেষ্টায় এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাঙ্গালায় অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও চারিদিক্ ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব মাটির উপরিভাগে পড়িয়া আছে। অনায়াসেই খুঁজিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু খুঁজিবার লোক কই? অনেকের আগ্রহ আছে শক্তি নাই, অনেকের শক্তি আছে আগ্রহ নাই; অনেকে ঘরে বসিয়া কাজ করেন, বাহিরে ঘুরিতে পারেন না; অনেকে বাহিরে ঘুরিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের চোখ পরিস্ফুট হয় নাই। আবার একদল আছেন, তাঁহারা কাজ করুন বা না করুন নিজের জয়ধ্বনি নিজে করিয়া লোকের কান কালা করিয়া দেন; বিদ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, বিদ্যার পুরস্কারগুলির দিকে লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন।

একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন। ইতিহাস খুঁজিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পুরাতন জায়গা সকল খোঁড়া হইতেছে। পুরুষপুর, তক্ষশীলা, শ্রাবস্তী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কত গূঢ়তত্ত্ব বাহির হইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় এখনও এক কোদাল মাটিও উল্টান হয় নাই। সপ্তগ্রাম একটু আধটু খুঁড়িলে অনেক খবর পাওয়া যাইবে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণ, বিহার, বল্লালঢিপি অনেক কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে। বলিবে এ সকল কথা অল্পদিনের; কিন্তু যাও না পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে, যাও না গৌড়ে, যাও না কর্ণসুবর্ণে। এ সকল জায়গা ত আধুনিক নহে, এ সকল খুঁড়িলে অনেক পুরাণ তত্ত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্যম কই, অধ্যবসায় কই? এইরূপ সম্মিলন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

তাই বলি, যখন আপনারা বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়াছেন, তখন যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের, বঙ্গীয় ইতিহাসের, বঙ্গীয় জীবনের গতি ফিরে, যাহাতে বাঙ্গালী উন্নতির পথে দ্রুতগতি ধাবিত হয়, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করুন।